লোক প্রশাসন সাময়িকী
১০ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ৯৭, পৌষ ১৪০৪

ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ঃ একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের *

ভূমিকা

ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আলোচনার আগে 'স্থানীয় সরকার' বলতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে ধারণা নেয়া প্রয়োজন। স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা যা স্থানীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য গঠিত হয়ে থাকে, তাকে সাধারণত স্থানীয় সরকার বলা হয়। স্থানীয় সরকারের কোন সার্বভৌম শক্তি না থাকায় স্থানীয় সরকারের গঠন, কার্যপরিধি ও আর্থিক ক্ষমতা বিভিন্ন আইন, বিধি ও সার্কুলারের মাধ্যমে জাতীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাত্ত্বিকগণ আকার, কাঠামো, সীমাবদ্ধতা কিংবা ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে স্থানীয় সরকার প্রত্যয়টি সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৪০ এর দশকে জি. মন্টাগো মরিস স্থানীয় সরকার এর দু'ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রথমত, স্থানীয় সরকার হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সংস্থাসমূহ যারা সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং দায়িত্বাবলীর জন্য জাতীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সরকার কোন এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত সরকার। এই স্থানীয় সরকারসমূহ জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকার কিছু কিছু ক্ষমতা বা দায়িত্বাবলী পায়, যা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে এসব প্রতিষ্ঠান কার্যকর করতে পারে। মন্টাগো মরিসের মতে যদিও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের এখতিয়ার এবং দায়িত্বাবলীর তারতম্য রয়েছে, তবুও পদ্ধতি দু'টি মোটামুটি পাশাপাশিভাবে চালু রয়েছে।

চার্লস ব্যরই বলেছেন, স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝায়; যাদের দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে। দায়িত্বাবলী পালনের নিমিত্তে নিজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে স্থানীয় সরকার কর ধার্য করতে পারে। যদিও জাতীয় সরকার জনস্বার্থে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করে, তবুও তারা জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে কাজ

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

করে বা জাতীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। এনসাইক্লোপেডিয়া অব সোশ্যাল সায়েন্সের নয় ও দশ নম্বর ভলিউমে উইলিয়াম এ. রফসন স্থানীয় সরকারকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন "স্থানীয় সরকার বলতে একটি ভূখন্ডগত অসার্বভৌম সম্প্রদায়কে বুঝায়, যাদের নিজস্ব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারীর মত প্রয়োজনীয় আইনগত অধিকার সংগঠন আছে।" জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী "স্থানীয় সরকার হলো একটা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উপ-বিভাগ, যা আইন দ্বারা গঠিত হয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমুদয় কার্যক্রমে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষমতা, বিশেষভাবে কর ধার্য করার ক্ষমতা রাখে।"

এ আলোচনায় স্থানীয় সরকারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিভাত ঃ

(১) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা বৈধ কর্তৃত্বের অধীন;

(২) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো স্থানীয় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার জন্য গঠিত একটি সংস্থা;

(৩) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো কর ধার্যকরণ ও প্রশাসন পরিচালনার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত একটি সংগঠন যার নিজস্ব কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনা করার অধিকার থাকে;

(৪) এ সরকার প্রকৃতভাবে জাতীয় সরকারের নিকট দায়বদ্ধ এবং অধীনস্থ।

ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দীর্ঘদিনের বিকাশমান প্রক্রিয়ার ঐতিহ্য বহন করে গড়ে উঠেছে। ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে প্রায় তিন হাজার বছর আগে। অর্থাৎ ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিকাশ হওয়ার সূচনালগ্ন থেকেই। তবে ভারতের বিশাল আয়তনের কারণে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের স্থানীয় সরকার ভিন্নতর প্রকৃতি নিয়ে বিকশিত হয়েছে। ভারতে বৃটিশদের আগমনের পরে ভারতের সরকার কাঠামোর কেন্দ্রে পাশ্চাত্য ধাঁচের একক সকার ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভারতে একক এবং শক্তিশালী কোন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেনি।

যা হোক, এই প্রবন্ধে মূলত ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তন অর্থাৎ প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কিভাবে বিকশিত হয়েছে, ভারতে বৃটিশদের আগমনের পরে বৃটিশদের প্রবর্তিত পাশ্চাত্য ধাঁচের শাসন ব্যবস্থার সংস্পর্শে এসে ভাবতের সনাতনী ধাঁচের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কতখানি প্রভাবিত হয়েছে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামো এবং গঠন প্রক্রিয়া কেমনভাবে বিকশিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে শহুরে এবং গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠন, কাঠামো এবং বিকাশ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে পৃথকভাবে অথচ পাশাপাশিভাবে আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী

এবং আর্থিক ব্যবস্থা অর্থাৎ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের উৎসসমূহ এবং ব্যয়ের খাতসমূহ সম্বন্ধীয় আলোচনা করা হয়নি এ প্রবন্ধের কলেবর সীমাবদ্ধ রাখার জন্য।

এ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ দেশ হিসেবে ভারত ১২,২৯,০০০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত। উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভারত একটি বৈচিত্রমন্ডিত দেশ। ভৌগোলিকভাবে ভারতকে তিনটি মৌলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন (ক) উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় অববাহিকায় বিস্তীর্ণ সমতলভূমি, যা মূলত আর্যদের আবাসভূমি হিসেবে পরিচিত। (খ) হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত উত্তর পূর্ব অঞ্চল, যা মঙ্গোলীয় ও অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠী দ্বারা অধ্যুষিত। (গ) দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চল, যা বিন্ধ্য পর্বতমালা দ্বারা উত্তর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং সমুদ্র তীরবর্তী পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে গঠিত হয়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মিলনস্থল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তাছাড়াও মাদ্রাজ বন্দরের নিকটবর্তী দক্ষিণ অঞ্চল, যা দ্রাবিড়দের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ৮৪০ মিলিয়ন এবং মাথাপিছু আয় ২৬০ মার্কিন ডলার। ভারতীয় সমাজ মূলত কৃষিভিত্তিক। যদিও অধিকাংশ ভারতীয় (প্রায় ৮৩%) হিন্দু, তথাপি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় যেমন মুসলিম, খৃষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন ভারতে রয়েছে। ভারতীয় সংবিধান ১৪টি প্রধান ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়া শত শত ভাষা ও কথা ভারতীয় পল্লী অঞ্চলে কথিত হয়। প্রধান ভাষাগুলো হলো হিন্দী, ইংরেজী, ইন্দো-ইউরোপীয়, দ্রাবিড়ীয়, চীনা-তিব্বতীয় ও অষ্ট্রিক।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে কার্যকর হয়। এ সংবিধানে মোট ৩৯৫টি আর্টিকেল ও সিডিউল রয়েছে। ভারতের সংবিধান সংসদীয় সরকার পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ভারতের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধান মাত্র। নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত এবং তিনি সরকারের প্রধান। কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট এবং প্রধানমন্ত্রী সংসদের নিম্নকক্ষের (লোকসভা) নিকট দায়ী। এই সংবিধান ক্ষমতা বিভাজনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। অধিকাংশ ক্ষমতা এমন কি Residual Powersও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ন্যস্ত। রাজ্য সরকার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন জনশৃঙ্খলা, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা, কৃষি, পানি সরবরাহ ও সেচ, শিক্ষা, গণস্বাস্থ্য, ভূমি, শিল্প এবং স্থানীয় সরকার পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের প্রশাসন পরিচালনার জন্য অধিক কর ধার্যের ক্ষমতাও আছে এবং ভূমি ব্যবহার ও বন্টন, শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য নীতি নির্ধারণের ক্ষমতাও রয়েছে।

প্রাচীন যুগ

ভারতে স্থানীয় সরকারের বিবর্তন ঃ

প্রাচীনকালে ভারতের গ্রামসমূহ যখন থেকে বিকশিত হতে শুরু করেছে, ভারতে স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থাও তখন থেকে বিকশিত হয়েছে। ঋগ্‌বেদে ১২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেই স্বশাসিত গ্রামীণ সরকারের কাঠামোর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। Sir Charles Metcalfe এই ধরনের সরকারকে Village Republic বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১] ঐতিহাসিক খান্না বলেছেন, প্রতিটি গ্রামেই স্বশাসিত কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব ছিল, যা অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে গ্রামীণ কাঠামোর মধ্য থেকে সমুদয় কার্যক্রম সম্পাদন করত, যা বর্তমান সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার মতোই ছিল। তখন গ্রামীণ কাঠামোতে যে আয় হত সেগুলি জনসাধারণের সুবিধার জন্য ব্যয় করা হতো। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই মহাত্মা গান্ধী স্বাধীন ভারতীয় সমাজ গঠনের চিন্তা করেছিলেন, যা স্ব-নির্ভর গ্রাম কাঠামোর মাধ্যমে বিকশিত হতে পারত বলে তিনি ধারণা করেছিলেন।

ভারতের স্থানীয় সরকার সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষক দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের গঠন ও কাঠামোর কারণে ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্নমুখী রূপ লাভ করেছে। কিছু এলাকায় সংখ্যালঘু জমিদাররা শাসন করত। তাদের অবস্থান ছিল মূলত হিন্দু জাতিভেদ ভিত্তিক পদ্ধতির অনুরূপ। পরোক্ষভাবে এসব গ্রামবাসী দূরে অবস্থানকারী জমিদারদের প্রতিনিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো এবং প্রত্যক্ষভাবে গ্রামবাসীরা Headman দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। Headman এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজে প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। যদিও তাদের কাজকর্ম, ক্ষমতা এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে তাদের অবস্থান ভারতের অঞ্চলগত ভিন্নতার কারণে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ছিল। Headmanগণ সাধারণত হিন্দু বর্ণ ও গোত্র শাসনকারী এবং নিয়ন্ত্রণকারী পরিবারের প্রধান ও কর্তৃত্বকারী হিসেবে কাজ করতো। অনেক সময় যুবরাজগণ আনুষ্ঠানিকভাবে Headman দ্বারা মনোনীত হতেন। তারা গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করতেন না। গ্রামের সব ধরনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজ কর্মের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের সেতুবন্ধন হিসেবে এই Headmanকাজ করতেন। সরকার যে ধরনের কর বা খাজনা ধার্য করে দিতো, তা আদায় করে সরকারের কাছে জমা দেয়াই ছিল হেডম্যানদের মূল কাজ। খাজনা আদায় করার এই পদ্ধতির মাধ্যমেই মূলত গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছিল।

পঞ্চায়েতঃ গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সভা এবং গ্রামীণ সমাজ গঠনের বহু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, যা ৬০০ খৃষ্টপূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। তবে

---

১. Sir Charls Metcalfe (1952) : Report of the Select Committee of the House of Commons. Vol. III. 1952

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পঞ্চায়েতের গঠন ও কার্যক্রম বিভিন্ন রকম ছিল। পঞ্চায়েতের কোন দাপ্তরিক কাঠামো এবং বিধি বিধান ছিল না। সাধারণত পঞ্চ য়েতসমূহের গঠন হতো একটি গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা বিতরণের জন্য। উত্তর ভারতে মূলত চার ধরনের পঞ্চায়েত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলো হলো ঃ

ক) **The caste Panchayet** (বর্ণ-ভিত্তিক পঞ্চায়েত) ঃ নির্দিষ্ট বর্ণের লোকজন যাতে সামাজিক আচরণ ও বিধানগুলো মেনে চলে, সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল এই পঞ্চায়েতের। উচ্চ বর্ণের ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো জাগ্রত রাখা এবং বর্ণের লোকজনের মধ্যে বিরোধ মিমাংসা করা ছিল বর্ণভিত্তিক পঞ্চায়েতের মূল কাজ।

খ) **গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ** আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং গ্রামের ফৌজদারী এবং দেওয়ানী ধরনের বিরোধসমূহ মিমাংসা করা ছিল এই পঞ্চায়েতের মূল কাজ। রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের জন্য কূপ খননের মতো কল্যাণমূলক কার্যক্রম এই পঞ্চায়েত সম্পাদন করত। সাধারণত উচ্চ বর্ণের নেতাদের দ্বারাই গ্রামীণ পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রিত হত। Headmanগণ বিভিন্ন জটিল বিষয়ে সমাধানের জন্য পঞ্চায়েত-এর সাহায্য গ্রহণ করতেন।

গ) **একক উদ্দেশ্যে গঠিত পঞ্চায়েত ঃ** সাধারণত আন্তঃগোত্র বিরোধসমূহ মীমাংসা করার জন্য এই পঞ্চায়েত গঠিত হত।

ঘ) **বিরোধ মীমাংসামূলক পঞ্চায়েত ঃ** কৃষক এবং ভৃত্য অথবা ভূস্বামী ও প্রজার বিরোধ মিটানোর জন্য এ ধরনের পঞ্চায়েত গঠিত হত। উচ্চ বর্ণের লোকদের মধ্য থেকে এই পঞ্চায়েত গঠিত হত।[২]

পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তবে এই পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে সমাজে বর্ণ প্রথা প্রকটতা লাভ করে। ভারতীয় সমাজে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বর্ণভিত্তিক পঞ্চায়েত অধিক মাত্রায় ক্রিয়াশীল এবং দীর্ঘমাত্রায় স্থায়ী হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণ ভারতে সাধারণত গ্রামীণ পঞ্চায়েতগুলি "গ্রাম সভা" এবং "মহত্তর সভা" নিয়ে গঠিত হতো। সাধারণত তারা বিভিন্ন গোত্র এবং বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করত। তবে এর সদস্য হতে হলে ন্যূনতম সম্পত্তির মালিক হতে হতো। ভিক্ষুক, ভবঘুরে ও অস্পৃশ্য ব্যক্তিরা পঞ্চায়েতের সদস্য হতে পারত না। এখানে কোন নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় সরকারসমূহ অনেক বেশী কার্যকর ভূমিকা পালন করত। দক্ষিণ ভারতের পঞ্চায়েতগুলিকে প্রায়শই জলদস্যু ও লুটেরা দলগুলির বিরুদ্ধে টহল প্রদান করতে হতো। এ ব্যবস্থার অধীনে পঞ্চায়েতগণ পথ, ব্রীজ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। তাঁরা খাজনা আদায়কারী কর্তৃপক্ষকে খাজনা ধার্য ও আদায়ের ব্যাপারে সহায়তা করতেন।

পূর্ব ভারতের বিশেষত গাঙ্গেয় অববাহিকার গ্রামীণ স্থানীয় সরকার সম্বন্ধে খুব একটা

---

২. R. C. Majumdar : The History & Culture of Indian People. Vol-II. Bombay. India. 1960

বেশী জানা যায় না। তবে এটা অনুমান করা যায় যে, উত্তর ভারতের সাথে এ অঞ্চলের যোগাযোগ থাকায় উত্তর ভারতের ব্যাপক প্রভাব এই অঞ্চলের সমাজের উপরে পড়েছিল। কিন্তু এই সমাজগুলি বিভিন্ন ধরনের মাইগ্রেন্ট জনগোষ্ঠীর প্রভাবে বেশ উৎকর্ষ পেয়েছিল।

পঞ্চায়েতের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিলো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এ কাজ করতে গিয়ে পঞ্চায়েত পুলিশি এবং বিচার কার্যক্রম সম্পাদন করতো। যে সব বিরোধ বিভিন্ন পেশাদারী সংগঠন এবং ব্যবসায়ী ও দলের মধ্যে মিমাংসা হতোনা, তা মূলত গ্রাম পঞ্চায়েত মিমাংসা করতো। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ যে মীমাংসা করে দিতো তা গ্রামবাসীদের দ্বারা শুধু গৃহীতই হতো না বরং প্রশংসিত হতো। রীতিনীতি এবং ধর্মীয় বিধি-বিধান পঞ্চায়েতকে অত্যন্ত পবিত্র স্থানে আসীন করেছিল। পঞ্চায়েতরা সাধারণত উচ্চ বর্ণের লোকজনের ঐক্যমতের ভিত্তিতে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং তা নিম্ন বর্ণের লোকদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হতো।

মধ্যযুগের স্থানীয় সরকার

ক) গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ঃ

শেরশাহ সূরীর শাসন আমলে (১৫২৯-৪৫) সাধারণ প্রশাসন এবং কর প্রশাসন ব্যবস্থায় যে ব্যাপক সংস্কার আনা হয়েছিল তা মূলত মধ্যযুগের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেছিল। তাঁর সময়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সম্রাট আকবরের শাসনামলে (১৯৫৫-১৬০৫) আরও কার্যকর এবং সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। পল্লী এলাকায় মুঘল শাসন চার স্তর বিশিষ্ট ছিল, যা মূলত কর আদায়ের জন্য গঠিত হয়েছিল। প্রদেশগুলি গভর্ণর (সুবাদার) দ্বারা, জেলাগুলি (সরকার) শিকদার দ্বারা, পরগণাগুলি ফৌজদার দ্বারা এবং গ্রামগুলি পরিচালিত হতো গ্রামপ্রধান দ্বারা। প্রতিটি স্তরেই আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার কার্যক্রম এবং পৌর কার্যাবলী সম্পাদনের সাথে সাথে খাজনা আদায় করা ছিল এই সময়ের শাসকবর্গের একটি অন্যতম কাজ। এভাবেই পরগণা পর্যায়ে কর্মরত ফৌজদারকে কাজী এবং মীরদাল নামক কর্মকর্তাগণ সহযোগিতা করতেন। আর চৌকিদাররা গ্রামপ্রধানকে পুলিশী কার্যক্রম সম্পাদনে যথাযথভাবে সহযোগিতা করতেন।[৩]

এ ধরনের নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা পঞ্চায়েত ভিত্তিক গ্রামীণ কাঠামোর স্বশাসিত সরকার ব্যবস্থার উপরে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। আর এই প্রভাবগুলি হলো ঃ

(১) কোন কোন এলাকায় পুলিশী কার্যক্রম কেন্দ্রীয় সরকার নিজ হাতে তুলে নিয়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়।

৩. Masudul Hassan : History of Local Government in Pakistan. Gop. Islamabad. 1985.

(২) অনেক গ্রামে গ্রামপ্রধানদের খাজনা-আদায় এবং শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কমে যায়।

(৩) মুঘলদের প্রবর্তিত খাজনা আদায় ব্যবস্থা মূলত সমাজে খাজনা আদায়কারী জমিদার শ্রেণী সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। তাছাড়া এ ব্যবস্থা করদাতা ও কর আদায়কারী প্রশাসনের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি করে।

খ) শহুরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ঃ

মুঘল শাসকবর্গ শহুরে জীবনে অভ্যস্থ ছিল এবং তারা আবশ্যিকভাবে শহর কেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠনের ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় আগ্রহী ছিল। প্রতিটি শহর সুসঙ্গায়িতভাবে ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি সুনির্দিষ্ট ভ্রাতৃগোষ্ঠী বাস করতো। প্রতিটি ওয়ার্ড অথবা মহল্লায় একজন মীর-মহল্লাহ থাকতেন যিনি জনগণের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতেন। কোতোয়াল হিসেবে নিযুক্ত অফিসার শহরের সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা তদারক করতেন। তিনি মিউনিসিপ্যাল কার্যাবলী, ম্যাজিষ্ট্রেরিয়াল কার্যক্রম, পুলিশি কার্যক্রম এবং আর্থ ব্যবস্থাপনার তদারককারী হিসেবে কাজ করতেন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিয়োজিত কাজী এবং অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধের দায়িত্বে নিয়োজিত মোহতাসিব কোতয়ালকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতেন। সরকার শহরগুলিতে খানকার ব্যবস্থাপনা চালু করেছিলেন যেখানে বিনামূল্যে পথচারী এবং অভাবীদের খাদ্য ও আশ্রয় প্রদান করা হতো।[৪]

ব্রিটিশ আমল

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে ব্রিটিশরা নবগঠিত কলোনী ভারতের উপরে সর্বোচ্চ মাত্রায় ভূমি কর আদায় এবং সেই সাথে সাথে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে দমননীতি পরিচালনা শুরু করে। বৃটিশরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ এবং অন্ধ্র প্রদেশে জমিদারী ব্যবস্থা চালু করে। মাদ্রাজ অর্থাৎ বর্তমান তামিলনাড়ুতে রায়তওয়ারী প্রথা চালু করা হয়। পাঞ্জাব ও মধ্য প্রদেশে মহলওয়ারী প্রথা চালু করা হয়। ১৯৭২ সালের প্রকাশিত গভর্ণমেন্ট অব বেঙ্গল প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয় যে, মুঘল আমলে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতক জুড়ে পর্যায়ক্রমে দুর্বল করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। জমিদাররা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করে সেখানে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিল।[৫]

বৃটিশ শাসনাধীন ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইতিহাস বিশ্লেষকবর্গ মোট ৪টি ভাগে বিভক্ত করেছে। এ গুলি হলো ঃ

প্রথম পর্ব (১৬৮৭ থেকে ১৮৮১ সাল) ঃ

এ সময়কালে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

---

৪. Ibid.

৫. Kamal Siddqui : Local Government in South Asia. UPL. Dhaka.

১৬৮৭ সাল ঃ মাদ্রাজে পৌর কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা।

১৭২৬ সাল ঃ মাদ্রাজের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এর স্থলে মিউনিসিপ্যাল কোর্ট প্রতিষ্ঠা।

১৮৪২ সাল ঃ বেঙ্গল এ্যাক্ট দ্বারা বাংলার জেলা পর্যায়ের শহরগুলিতেও মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

১৮৫০ সাল ঃ বেঙ্গল এ্যাক্ট সমগ্র দেশব্যাপী সম্প্রসারণ।

১৮৬৩ সাল ঃ স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা ইত্যাদি দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠন করার জন্য প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতা প্রদান।

১৮৭০ সাল ঃ লর্ড মেয়ো কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশনের উপরে গুরুত্বারোপ করে মিউনিসিপ্যাল প্রশাসনের সাথে সর্ব ভারতীয়দের সম্পৃক্ত করার আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হয়। ভিলেজ চৌকিদারী আইন-১৮৭০ প্রণয়নের দ্বারা চৌকিদারদের (গ্রাম পুলিশ) প্রতিপালনের জন্য খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামীণ পর্যায়ে গ্রাম পুলিশ (চৌকিদার) এর প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের পথ সুগম করা হয়।

বৃটিশরা শহরকেন্দ্রিক জীবনের প্রতি বেশী মাত্রায় আকৃষ্ট হওয়ায় এই সময়ে শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকাশের অধিকতর তৎপরতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলত মনোনীত প্রতিনিধি/কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হতো বলে ভারতীয়রা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে তেমন ভূমিকা রাখতে পারতো না। চৌকিদারী আইনের মূল লক্ষ্য ছিল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি বিধান করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ মাত্রায় ট্যাক্স আদায় নিশ্চিতকরণ।

দ্বিতীয় পর্ব (১৮৮২ থেকে ১৯১৯ সাল) ঃ

এ সময়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। লর্ড রিপোন এর নেতৃত্বে ভারতীয় সরকার ১৮৮২ সালে একটি রেজুলেশন পাশ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রথম বারের মতো বেসরকারী প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়া চালু করে। বোম্বে মিউনিসিপ্যাল আইন ১৮৮৮ সালে পাশ হওয়ার পরে ভারতের সমস্ত বড় বড় শহরে মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানের কাঠামো গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯০৯ সালে বিকেন্দ্রীকরণের উপরে রয়েল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের মাধ্যমে ভারতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য পটভূমি তৈরিকারী নীতিসমূহ প্রয়োগের জন্য পুনরায় দাবী উত্থাপিত হতে থাকে। ১৯১৮ সালে আরেকটি রেজুলেশন পাশ করে ভারতের গ্রামগুলিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়। স্থানীয় সরকারগুলি নির্বাচিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হওয়া উচিৎ এবং সর্বজনীন

১৬৮৭ সাল ঃ মাদ্রাজে পৌর কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা।

১৭২৬ সাল ঃ মাদ্রাজের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এর স্থলে মিউনিসিপ্যাল কোর্ট প্রতিষ্ঠা।

১৮৪২ সাল ঃ বেঙ্গল এ্যাক্ট দ্বারা বাংলার জেলা পর্যায়ের শহরগুলিতেও মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

১৮৫০ সাল ঃ বেঙ্গল এ্যাক্ট সমগ্র দেশব্যাপী সম্প্রসারণ।

১৮৬৩ সাল ঃ স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা ইত্যাদি দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠন করার জন্য প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতা প্রদান।

১৮৭০ সাল ঃ লর্ড মেয়ো কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশনের উপরে গুরুত্বারোপ করে মিউনিসিপ্যাল প্রশাসনের সাথে সর্ব ভারতীয়দের সম্পৃক্ত করার আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হয়। ভিলেজ চৌকিদারী আইন-১৮৭০ প্রণয়নের দ্বারা চৌকিদারদের (গ্রাম পুলিশ) প্রতিপালনের জন্য খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামীণ পর্যায়ে গ্রাম পুলিশ (চৌকিদার) এর প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের পথ সুগম করা হয়।

বৃটিশরা শহরকেন্দ্রিক জীবনের প্রতি বেশী মাত্রায় আকৃষ্ট হওয়ায় এই সময়ে শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকাশের অধিকতর তৎপরতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলত মনোনীত প্রতিনিধি/কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হতো বলে ভারতীয়রা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে তেমন ভূমিকা রাখতে পারতো না। চৌকিদারী আইনের মূল লক্ষ্য ছিল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি বিধান করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ মাত্রায় ট্যাক্স আদায় নিশ্চিতকরণ।

দ্বিতীয় পর্ব (১৮৮২ থেকে ১৯১৯ সাল) ঃ

এ সময়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। লর্ড রিপোন এর নেতৃত্বে ভারতীয় সরকার ১৮৮২ সালে একটি রেজুলেশন পাশ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রথম বারের মতো বেসরকারী প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়া চালু করে। বোম্বে মিউনিসিপ্যাল আইন ১৮৮৮ সালে পাশ হওয়ার পরে ভারতের সমস্ত বড় বড় শহরে মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানের কাঠামো গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯০৯ সালে বিকেন্দ্রীকরণের উপরে রয়েল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের মাধ্যমে ভারতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য পটভূমি তৈরিকারী নীতিসমূহ প্রয়োগের জন্য পুনরায় দাবী উত্থাপিত হতে থাকে। ১৯১৮ সালে আরেকটি রেজুলেশন পাশ করে ভারতের গ্রামগুলিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়। স্থানীয় সরকারগুলি নির্বাচিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হওয়া উচিৎ এবং সর্বজনীন

ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকারগুলির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়া উচিৎ বলে ভারতের শাসকগোষ্ঠী মত ব্যক্ত করেন। সেই সাথে আর্থিক স্বাধীনতা প্রদানের কথাও রেজুলেশনে উল্লেখ করা হয়।

তৃতীয় পর্ব (১৯২০ থেকে ১৯৩৭ সাল) ঃ

এ সময়ে স্থানীয় সরকারগুলিকে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন পাশ করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বেশকিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এ আইনে জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় স্থানীয় সরকারগুলি ব্যাপক স্বাধীনতা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯২৩ সালের শেষের দিকে এসে বাংলার সমস্ত জেলায় জেলা বোর্ড বেসরকারী চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অগ্রগতি ছিল ভারতের সংবিধান প্রণয়ন, যা ১৯৫০ সালে কার্যকর হয়েছিল। এই সংবিধান প্রাদেশিক সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই দু'ধরনের সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। কিন্তু এই সংবিধান গ্রামীণ বা শহুরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে নীরবতা পালন করে। ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বর্ণনা কতে গিয়ে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র গ্রামীণ পঞ্চায়েতগুলিকে সংগঠিতকরণের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং পঞ্চায়েতগুলিকে এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করবে, যাতে তারা স্ব-শাসিত একক সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার মতো সামর্থ্যবান হয়ে উঠতে পারে (অনুচ্ছেদ-৪০)।

তাছাড়া সংবিধানের সপ্তম তফসীলে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, জেলা বোর্ড, মাইনিং সেটেলমেন্ট অথরিটির মতো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সমুদয় কর্মকান্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যাতে তারা স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হতে পারে অথবা গ্রামীণ শাসন পরিচালনা করার সামর্থ্য অর্জন করতে পারে। যেহেতু রাষ্ট্রীয় মূল নীতিগুলিকে বাধ্যকরী হিসেবে প্রয়োগ করার সুযোগ কম, সেহেতু সংবিধানের এ দু'টি বাধ্যবাধকতার দ্বারা বাস্তবিক অর্থে ভারতের স্থানীয় সরকারসমূহের বিকাশ প্রক্রিয়া মূলত প্রাদেশিক সরকারসমূহের মর্জির উপরে নির্ভরশীল থেকেছে, যা মহাত্মা গান্ধীর "স্বাধীন ভারতভূমি"র ধারণার পরিপন্থী হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

১৯৫২ সালে "কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম" (সিডিপি) নামক এপ্রোচ এর মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ভারতের প্রদেশসমূহের আত্মনির্ভরতা এবং আর্থিক ও টেকনিক্যাল সমর্থন লাভের আশা নিয়ে সি, ডি, পি প্রজেক্টসমূহ গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে নতুন জীবনযাত্রার পথ

এবং জ্ঞান প্রদর্শনের আলোকবর্তিকা হিসেবে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিন ধরনের বাস্তবায়ন স্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এগুলি ছিল (১) একজন জেলা উন্নয়ন কর্মকর্তা (কালেক্টর), (২) একজন ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তা (যাকে একদল সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সহযোগিতা করতেন), (৩) একজন গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয়ক কার্যক্রম সহযোগিতাকারী কর্মী যিনি সব ধরনের উন্নয়ন বাস্তবায়ন সহযোগী ছিলেন।

কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (সিডিপি) মূল্যায়নকারীদের দ্বারা এই কর্মসূচির বেশ কিছু সমালোচনা করা হয়েছে।[৬] এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ঃ

(১) এই কর্মসূচি মূলত আমলাদের দ্বারা পরিচালিত হত। এই আমলারা ভাল কর্মী ছিল বটে, কিন্তু তারা এই কর্মসূচির অন্তর্নিহিত বিষয়াবলী উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সরকারী কর্মচারীদের উপরে এরূপ অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি।

(২) শহুরে এবং গ্রামীণ উভয় ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলত কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অধিক্ষেত্রের বাইরে রাখা হয়েছিল। Balvantray Mehta-র নেতৃত্বে গঠিত একটি ষ্টাডি টিম ১৯৫৬ সালে এই কম্যুনিটি প্রজেক্টসমূহ এবং ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস-এর উপরে ব্যাপক গবেষণা কাজ চালিয়ে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনটি ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনে কয়েকটি বিষয়ের প্রতিফলন ঘটে। এগুলো হলো ঃ

(ক) উক্ত দুটো প্রোগ্রাম জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে উদ্যোগ অথবা উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়।

(খ) পঞ্চায়েতসমূহের উপরে একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় ঠিকই কিন্তু এই কর্মসূচি দ্বারা খুব বেশী উল্লেখযোগ্য কোন উদ্যম সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

(গ) এমনকি পঞ্চায়েতগুলিকে কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় আনা হয়নি।

এ কমিটির মতে দায়িত্ব এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ করা হলে উক্ত সমস্যাসমূহ অতিক্রম করা যেতে পারে। এ জন্য কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর উপর আলোকপাত করে ঃ

(১) তিন স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান (PRI) গঠন, যা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকবে। এগুলো হলো গ্রাম পর্যায়ে গ্রামীণ পঞ্চায়েত (VP), ব্লক পর্যায়ে পঞ্চায়েত সমিতি (PS)এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ (ZP)।

(২) কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম দ্বারা ইত:পূর্বেই যেহেতু ব্লকগুলিকে উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, সেহেতু পঞ্চায়েতী সমিতিকে এই

---

৬. S. C. Jair : Community Development and panchayeti Raj in India. Bombay, India, 1967

তিনটি স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পঞ্চায়েতী সমিতিকে নির্বাচনমূলক একটি ষ্ট্যাটিটিউট বডি করা হয়, যা কার্যক্রমের দিক হতে ব্যাপকতা দেখাবে। আর এর প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক এবং আর্থিক দিক থেকে কর্তৃত্ব থাকবে।

(৩) জেলা পরিষদ হবে সম্পূর্ণ সমন্বয়কারী এবং তত্ত্বাবধানকারী একটি সংস্থা, যার কোন প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকবে না।

(৪) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে ক্রিয়াশীল রাখা হবে।

(৫) পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে প্রকৃত অর্থে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হস্তান্তর করতে হবে এবং সকল পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে।

(৬) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা ও দায়িত্বের ডিভোলিউশন এর বিকাশ ঘটাতে হবে।

১৯৫৯ সালের ২রা অক্টোবরে ভারতের অন্যতম প্রদেশ রাজস্থানে পঞ্চায়েতীরাজ প্রথা প্রথম চালু করা হয়।

Balvantray Mehta কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা সত্তরের দশকে মোটামুটি সমগ্র ভারতের প্রাদেশিক সরকারগুলি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাবের প্রয়োজন অনুযায়ী কোন কোন প্রদেশে কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। মহারাষ্ট্র এ প্রদেশগুলির অন্যতম। এখানে জেলা পরিষদকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তামিলনাড়ুতে প্রতিটি প্রশাসনিক জেলাকে দুই/তিনটি করে উন্নয়ন জেলায় বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রতিটি উন্নয়ন জেলাতে একটি জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছিল। মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ডে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। জম্মু-কাশ্মীর, কেরালা, মনিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রদেশে শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েতই গঠিত হয়েছিল। আসাম এবং হরিয়ানাতে শুধুমাত্র দু'স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়।

যদিও ভারতীয় কংগ্রেস কেন্দ্র এবং প্রদেশে ক্ষমতাশীন ছিল, তবুও Balvantray Mehta কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহের পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ বিষয়ক আইন প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ নিতে পারতো, তবুও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এরূপ আইন প্রণয়নের জন্য তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান গঠনের লক্ষ্যে এই কর্মসূচি আবেগ প্রবণতার কারণে বেশ সমর্থন পেয়েছিল কিন্তু

কালক্রমে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থার সমস্যাগুলি বা অসুবিধাগুলি উদ্ভাসিত হতে থাকায় এ ব্যবস্থা বেশ কিছু সমালোচনার সম্মুখীন হতে থাকে। নারায়ন এবং মাথুর ১৯৮৭ সালে মত ব্যক্ত করেন "১৯৫৯ সালে যে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা ব্যাপক আশাবাদ এবং উদ্যোগের সহযোগে তার যাত্রা শুরু করেছিল, তা বছরের পর বছর ধরে তার উদ্যম পর্যায়ক্রমে হারিয়ে ফেলছে। ১৯৬৯ সালে এসে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাটা অপ্রাসংগিক বা অপ্রয়োজনীয় একটা ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করে।"

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এমনকি প্রাদেশিক সরকারসমূহও একটার পর একটা কমিশন এবং কমিটি গঠন করে এই পরিস্থিতি মোকাবেলার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। ১৯৫৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সময়ে (অথাৎ Balvantray Mehta কমিটি থেকে শুরু করে জনতা দলের প্রথমবারের মতো কেন্দ্রে ক্ষমতারোহণের সময় পর্যন্ত) পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়ে মোট ২৫টা কমিশন এবং ৪৮টা কমিটি গঠিত হয়েছিল। মৌলিক দিক দিয়ে বিবেচনায় এদের প্রকৃত কার্যকারিতা অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতা দল ক্ষমতায় আসার পরে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে অশোক মেহেতার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার জন্য মোট ৬টা সুপারিশ প্রণয়ন করে। এগুলি হলো ঃ

১। দুই স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান থাকা উচিৎ ঃ (ক) জেলা পর্যায়ের পঞ্চায়েতীরাজ, (খ) মন্ডল পর্যায়ের পঞ্চায়েতীরাজ যা গ্রাম পঞ্চায়েত (VP) থেকে বড় হবে কিন্তু পঞ্চয়েতী সমিতি (PS) থেকে ছোট হবে। আর জেলা হবে বিকেন্দ্রিকরণের কেন্দ্রবিন্দু।

২। আর্থিক দিক থেকে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান সমূহকে ট্যাক্স আদায়ের জন্য ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

৩। রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রকাশ্যে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ দিতে হবে।

৪। পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি জেলা পর্যায়ের এজেন্সী দ্বারা এবং সংসদীয় কমিটি দ্বারা সামাজিকভাবে নিরীক্ষিত (Social audit) হবে।

৫। পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি খন্ডিত কোন কারণে (Partisan Ground) সুপার-সিড করা যাবে না। যদি এরূপ ঘটে, তবে ছয় মাসের মধ্যে নতুনভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ "আরবান এমিনিটিস" বা শহুরে সুবিধাদি সরবরাহ করবে, যাতে গ্রাম থেকে শহরে ব্যাপকভাবে অভিগমন প্রবণতা কমানো যায়।

এই প্রতিবেদনের পরামর্শসমূহ গ্রহণ করার আগেই কেন্দ্রে এবং বেশ কয়েকটি প্রদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। কংগ্রেস (আই) নতুনভাবে ক্ষমতাসীন হয়ে অন্য একটি

রাজনৈতিক দলের দ্বারা গঠিত কমিটির প্রতিবেদন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তেমন কোন আগ্রহ প্রদর্শন করেনি। ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশন দারিদ্র বিমোচন এবং পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাসমূহ পর্যবেক্ষণের জন্য G.V.R Rao এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। ১৯৮৫ সালে এই কমিটি পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করার সুপারিশ করে বলে যে, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জেলা পরিষদেরই মুখ্য সংস্থা হিসেবে কাজ করা উচিৎ। এই কমিটি আরও মত ব্যক্ত করে যে, গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্যে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় জনসাধারণকে সেবা প্রদান করতে পারবে।

অশোক মেহেতা এবং G.V.R Raoএর নেতৃত্বে প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিসমূহের সুপারিশ প্রদানের পরবর্তী বছরগুলিতে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সবকিছু বিশ্লেষণে একথা বলা ভুল হবে না যে, ষাট এর দশকের পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান এবং আজকের ভারতের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (পঞ্চায়েতীরাজ) মধ্যে তেমন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। তবে উল্লেখযোগ্য যে, "পঞ্চায়েত বিল" অর্থাৎ সংবিধানের ৬৪তম সংশোধনী বিল-১৯৮৯ সংসদে উপস্থাপন করে তৎকালীন ভারতীয় সরকার পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (যাতে প্রাদেশিক সরকারগুলি কেন্দ্রের অনুমোদন ছাড়াই নিতে পারে তার বিধান প্রণয়নের পদক্ষেপ) গ্রহণ করে। কিন্তু রাজ্য সভায় বিরোধী দলের বিরোধিতার কারণে এ বিলটি পাশ হতে পারেনি।

শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ১৯৫০ সালে রচিত ভারতীয় সংবিধানে শহুরে অথবা গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশের ব্যাপারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার যদিও শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকাশের জন্য বেশ উৎসাহ প্রদান করেছিল, কিন্তু তার কাঠামো এবং কার্যাবলীর দায় ভার মূলত প্রাদেশিক সরকারের উপরই গিয়ে পড়ে। গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মতই শহুরে প্রতিষ্ঠানসমূহকে কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের পরিকল্পনার আওতার বহির্ভূত রাখা হয়েছিল। কুড়ি এবং ত্রিশের দশক জুড়ে ব্যাপক পরিমাণে পৌর আইনসমূহ পাশ হয়েছিল। আর ১৮৮৮ সালে বোম্বে আইন পাশ হয়েছিল, যা পৌর সভাসমূহ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আইনসমূহের আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করছে। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং পাঞ্জাব এসব প্রদেশে পুরাতন পৌর আইনসমূহ কার্যকর থেকেছে। আর আসাম (১৯৬০) উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ (১৯৬৫), কেরালা (১৯৫৬), কর্ণাটক (১৯৬৪) এবং উত্তর প্রদেশ (১৯৬০) স্বাধীনতা উত্তরকালে তাদের পৌর সভাসমূহের মর্যাদার উন্নতকরণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করেছে। দু'টি বিষয় এজন্য দায়ী ঃ

(১) প্রদেশের সীমারেখা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি প্রদেশে শহুরে সরকার সমূহ একাধিক আইন দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ফলে বর্তমানে একাধিক আইন সমন্বিত করে একটি আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে।

(২) উত্তর প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের মত প্রদেশগুলি তাদের পৌর আইনসমূহ কয়েক দশক আগে প্রণয়ন করেছে যদিও তা অপর্যাপ্ত এবং এগুলি হাল নাগাদকরণের প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ স্বাধীনতা- উত্তরকালে ভারতে পৌর আইনসমূহ প্রণয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে মূলত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অবস্থা কাজ করেছে। পৌর-সভাসমূহের অনেক কাজই প্রাদেশিক সরকারসমূহ অথবা প্রাদেশিক সরকার সৃষ্ট বিশেষ কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। পানি, বিদ্যুৎ, যানবাহন ব্যবস্থাপনা, শহুরে পরিকল্পনা ইত্যাদি কার্যক্রম পৃথক একটি সংস্থা দ্বারা সম্পাদন করার প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবিধানের ৬৪তম সংশোধনী বিলে কংগ্রেস (আই) সরকার নগরপালিকা বিল ১৯৮৯ প্রণয়নের মাধ্যমে শহুরে স্থানীয় সরকারসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু পঞ্চায়েত বিলের সাথে এই বিলটিও রাজ্য সভায় গত ১৩ই অক্টোবর, ১৯৮৯ সালে বিরোধী দলের বিরোধিতার কারণে পাশ হতে পারেনি।[৭]

স্থানীয় সরকারগুলোর কাঠামো এবং গঠন

গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ

বাংলাদেশের মতোই ভারতের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাতে মূলত তিনটি স্তরের বিকাশ ঘটেছে। প্রথমত; সর্বনিম্ন বা গ্রামীণ পর্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েত, দ্বিতীয়ত; মধ্যস্তরে অর্থাৎ ব্লক পর্যায়ে পঞ্চায়েত সমিতি, তৃতীয়ত; সর্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ। অবশ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নভাবে এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়েছে। তবে মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং লাক্ষ্যদ্বীপের মতো ইউনিয়ন টেরিটোরিতে কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকশিত হয়নি। শুধু অন্ধ্র, বিহার, গুজরাট, হিমাচল, কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গে তিনস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ভারতে টিকে আছে। ভারতের কোন ইউনিয়ন টেরিটোরিতে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু নাই। আসাম, হরিয়ানা, মনিপুর ও উড়িষ্যা-এ চারটি প্রদেশে এবং দিল্লী ও পন্ডিচেরী নামক দুটি ইউনিয়ন টেরিটোরিতে গ্রাম এবং ব্লক (অর্থাৎ মহকুমা বা তাল্লুক) পর্যায়ে দু'স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর জম্মু ও কাশ্মীর, কেরালা, সিকিম এবং ত্রিপুরা-এই চারটি প্রদেশে এবং আন্দামান ও নিকোবর আইল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, চন্ডিগড়, দিল্লী প্রভৃতি ইউনিয়ন টেরিটোরিতে শুধু একস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান চালু আছে।

---

৭. N. Sivanna : Panchayeti Raj Reforms & Rural Development, Chugh Publications, Alahabad, India-1990.

১৯৭৭ সালে Balvantray Mehta কমিটি ভারতে তিনস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করে। কিন্তু যেহেতু ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন, সেহেতু বেশ কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার এই কমিটির সুপারিশমালা গ্রহণ করেনি। বরং এ সব প্রাদেশিক সরকারসমূহ বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের প্রবর্তিত আইনসমূহ সামান্য মাত্রায় সংশোধিত করে পূর্ববৎ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থারই বরং বিকাশ ঘটিয়ে এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সীমানা পুনঃনির্ধারণ করে স্থানীয়ভাবে কেন্দ্রের শক্তি বৃদ্ধির প্রতি ঝোঁক দেখায়। এসব অঙ্গরাজ্যসমূহ সাম্প্রতিককালে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক চাপ প্রভৃতি উপাদানসমূহ দ্বারা তাদের পছন্দের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এটা ধারণা করা যায় যে, কিছু কিছু প্রদেশ পুনরায় চিন্তা করে দেখবে যে, আশোক মেহেতা কমিটির প্রতিবেদন (যা ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়) অনুযায়ী দু'স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর কিনা?

পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানের মেয়াদকাল অবশ্য ভারতের সবগুলি প্রদেশে এক রকম নয়। তবে উল্লিখিত প্রদেশগুলিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্তর সম্বন্ধে তেমন কোন বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না। সাধারণভাবে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়াদ হয় পাঁচ বছর, যা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মেয়াদের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তবে মহারাষ্ট্রে এই মেয়াদ ৬ বছর, আসামে ৪ বছর, রাজস্থান ও সিকিমে ৩ বছর মেয়াদী হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু ভারতের স্থানীয় সরকারসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারসমূহ বা প্রাদেশিক সরকারসমূহ।

নীচে ভারতের স্থানীয় সরকারসমূহের বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় সরকারসমূহের পর্যায় ক্রমিক আলোচনা করা হ'ল ঃ

গ্রাম্য পঞ্চায়েত (Village Panchayet) ঃ

ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে গ্রাম্য পঞ্চায়েত হলো তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। তবে রাজ্যগুলিতে গ্রামীণ পঞ্চায়েতসমূহ বিভিন্ন রকমের এখতিয়ার নিয়ে গঠিত হয়েছে। একেকটি রাজ্যের গ্রামীণ পঞ্চায়েতের এখতিয়ার এবং কার্য-পরিধি নির্ধারণে একেকটি রাজ্য একেক রকমের পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশ ক্ষুদ্রাকৃতির পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠন করেছে। সেসব প্রদেশে মাত্র এক হাজার লোকের জন্য একটি পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে। অন্যদিকে তামিলনাড়ু এবং কেরালা বৃহদাকার পরিধি নিয়ে পঞ্চায়েত গঠন করেছে। এ প্রদেশ দু'টিতে ১৫,০০০

লোকের জন্য একটি পঞ্চায়েত গঠনের বিধান করা হয়েছে। এ জন্যই ভারতের প্রতিটি গ্রামে একটি করে পঞ্চায়েত গঠিত না হয়ে বরং যতগুলি গ্রাম আছে তার অর্ধেক সংখ্যক পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে। ১৯৮৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে মোট ৫,৮১,১৮৯টি পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছিলো।

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি মুলত সমন্বিত সংস্থা বা কর্পোরেট বডি। এগুলি গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের একটি একক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কম্যুনিটি উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের এজেন্সী হিসেবেও কাজ করে। পঞ্চায়েতগণ মূলত গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। তবে বেশকিছু মনোনীত ব্যক্তিত্ব পঞ্চায়েতগুলির সদস্য হন। আর নির্বাচন প্রক্রিয়া মূলত গ্রাম সভার দ্বারা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে আসাম, জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তর প্রদেশে হাত উচিয়ে ভোটাভুটির মাধ্যমে এখনও পঞ্চায়েতগণ নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এইভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পঞ্চায়েত এলাকাকে কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একজন করে সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। বিহারে এখনও মনোনয়নের মাধ্যমে পঞ্চায়েত সদস্যরা নির্বাচিত হন। এখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানসহ মোট ৫জন সদস্য নির্বাচিত হন আর বাকী ৪ জন সদস্য মনোনীত হয়ে থাকেন।

গ্রাম-পঞ্চায়েত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। মূলত ৫ থেকে ৩১ জন সদস্য নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়। তবে মহিলা, তফসীলি সম্প্রদায়, তফসীলি গোত্রসমূহের সামাজিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনার কথা চিন্তা করে বেশীর ভাগ স্থানেই এসব বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, হরিয়ানা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানগণ এলাকার সকল ভোটারের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অন্যান্য প্রদেশের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানগণ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে অনাস্থা প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে পঞ্চায়েত প্রধান অপসারিত করা যায়। তিনি সভা আহবান, আলোচ্যসূচি নির্ধারণ এবং উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী স্তর অর্থাৎ পঞ্চায়েত সমিতির এক্স-অফিসিও সদস্য হিসেবে কাজ করেন।

পঞ্চায়েতী সমিতি ঃ

পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী উচ্চতর ধাপ হলো পঞ্চায়েতী সমিতি। পঞ্চায়েতী সমিতি গ্রামীণ স্থানীয় সরকারসমূহের মধ্যবর্তী মৌলিক এবং সৃজনশীল স্তর হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৮৪ সালে ভারতে ৪৫২৬টি পঞ্চায়েতী সমিতি ছিলো। গড়ে একটি পঞ্চায়েতী সমিতির অধীনে ৪৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ক্রীয়াশীল থাকে।

সাধারণত এটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদ থেকে বেশি ক্ষমতাশালী। Balvantray Mehta কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, পঞ্চাশের দশকে ব্লক পর্যায়ে কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়িত হলেও ব্লক পর্যায়ে কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেনি। এ জন্যই উক্ত কমিটি ব্লক পর্যায়ে অর্থাৎ মধ্যবর্তী পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকাশের জন্য জোর সুপারিশ করেছিল। কয়েকটি প্রদেশ বাদে ভারতের সবগুলি প্রদেশেই দু'স্তর অথবা তিনস্তর বিশিষ্ট গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেছে। তবে আসাম, গুজরাট এবং কর্ণাটকে মহকুমা তাল্লুক পর্যায়ে অর্থাৎ ব্লক এবং জেলার মধ্যবর্তী পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। কাঠামোগতভাবে বিভিন্ন প্রদেশের পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে মৌলিক কাঠামোগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। পঞ্চায়েতী সমিতিসমূহের সীমারেখা এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে ভিন্ন হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো প্রতিটি পঞ্চায়েতী সমিতিই একটি কর্পোরেট বডি হিসেবে কাজ করে। পঞ্চায়েতী সমিতির সদস্যপদ মূলত দু'ভাবে অর্জিত হয়ে থাকে। (১) প্রতিনিধি সদস্যপদ, (২) কো-অপ্ট করা সদস্যবৃন্দ। প্রতিনিধি সদস্যরা আবার (ক) এক্স অফিসিও সদস্য (খ) সরাসরিভাবে নির্বাচিত সদস্য (গ) পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য এই তিন ভাবে এসে থাকেন। আর কো-অপ্ট করা সদস্যরা মূলত মহিলা, তফসীলি সম্প্রদায়, তফসীলি উপজাতি এবং বিশেষ স্বার্থ গোষ্ঠীর সহযোগী সদস্য এবং অফিসিয়াল সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে।

সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি সদস্যগণ মূলত মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতিসমূহের প্রতিনিধি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণই হয়ে থাকেন। এসব সদস্যদের ভোট দানের ক্ষমতা থাকে। পঞ্চায়েতী সমিতির সমগ্র এলাকা অথবা তার অংশ বিশেষের প্রতিনিধিত্বকারী এমএলএ গণ বা এমপিগণই মূলত সহযোগী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এদের কোন ভোট দানের ক্ষমতা নাই। প্রদেশসমূহের মধ্যে এমপি এবং এম এল এ গণের এই সহযোগিতার ধরনের মধ্যে ভিন্নতা আছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো প্রতিটি প্রদেশেই মহিলা, তফসীলি জাতি ও তফসীলি উপজাতিদের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার ব্যবস্থা আছে। কয়েকটি প্রদেশে বিশেষ স্বার্থ গোষ্ঠীকে (অর্থাৎ প্রগতিশীল কৃষক সমিতি, মার্কেটিং সোসাইটি এবং কো-অপারেটিভসমূহ) বিশেষত যারা প্রশাসনিক, পল্লী উন্নয়ন, সমাজকর্ম, পরিকল্পনা প্রণয়ন এর কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন; তাদেরকে কো-অপ্ট করার ব্যবস্থাও বেশ কয়েকটি প্রদেশে রাখা হয়েছে। তাদের ভোটাধিকার আছে। আর চতুর্থ রকমের সদস্যরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আসেন। একটি পঞ্চায়েতী সমিতির অধীন সকল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় আর প্রত্যক্ষ ভোট এলাকার সকল প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনকেই বুঝায়। শুধু কর্ণাটক প্রদেশে পঞ্চায়েতী সমিতির সদস্যরা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। আসাম, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ও এক্স-অফিসিও সদস্যদের নিয়ে পঞ্চায়েতী

সমিতি গঠিত হয়। অন্যদিকে হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি প্রদেশে কিছু সদস্য এক্স অফিসিও হলেও বাকী সকল সদস্যই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। সর্বশেষে বলা যায় যে, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, মনিপুর, উড়িষ্যা এবং তামিলনাড়ু রাজ্যে পঞ্চায়েতী সমিতিসমূহ এক্স অফিসিও সদস্যদের দ্বারা গঠিত হয়। হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গে ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তারা পঞ্চায়েতী সমিতিতে এক্স অফিসিও সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তারা পঞ্চায়েতী সমিতির সভাগুলিতে যোগদান করতেন, কিন্তু তাদের ভোটাধিকার ছিল না।

রাজস্থান ব্যতীত ভারতের সবগুলি প্রদেশেই পঞ্চায়েতী সমিতির চেয়ারম্যান গ্রামীণ পঞ্চায়েতের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সকল পঞ্চায়েতী সমিতির সদস্য, সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এবং নগর পঞ্চায়েতের সদস্য প্রমুখ প্রতিনিধির সমন্বয়ে বৃহত্তর নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হয়।

জেলা পরিষদ ঃ

পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশ হিসেবে জেলা পরিষদ নতুন ব্যবস্থা হলেও জেলা পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদ প্রাচীনতম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম। জেলা পরিষদ পঞ্চায়েতীরাজ কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তর। তবে বর্তমানে আসাম, হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরালা, মনিপুর, উড়িষ্যা, সিকিম এবং ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে জেলা পরিষদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমানে সমগ্র ভারতে ৩০০টি জেলা পরিষদ বিদ্যমান। এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে জেলা পরিষদের অর্পিত দায়িত্বের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই ভিন্নতা জেলা পরিষদের গঠন আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং কার্যক্রমের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ভূমিকার দিক থেকে চিন্তা করলে সমগ্র ভারতে জেলা পরিষদ তিন ধরনের হয়ে থাকে। এগুলি হলো ঃ

(ক) সম্পূর্ণভাবে তত্ত্বাবধানকারী এবং সমন্বয়কারী, যেমন রাজস্থান, তামিলনাড়ু, মধ্য প্রদেশ এবং বিহার প্রদেশে এই ব্যবস্থা চালু আছে।

(খ) জেলা পরিষদের এজেন্ট হিসেবে ক্রিয়াশীল পঞ্চায়েত সমিতির সম্পূর্ণ প্রশাসক হিসেবে, যেমন মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট।

(গ) এই দুই ধরনের ব্যবস্থার সমন্বয় অর্থাৎ সমন্বয়কারী এবং তদারককারীর ভূমিকার সাথে কর্তৃত্বকারী হিসেবে ক্রিয়াশীল জেলা পরিষদ যেমন-অন্ধ্র প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ ইত্যাদি।

যদিও এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশের জেলা পরিষদের গঠন ক্ষমতা ও কর্ম পরিধির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তবুও সাধারণভাবে জেলা পরিষদের সদস্যরা নিম্নলিখিতভাবে সদস্য পদ লাভ করেন ঃ

১। মধ্যবর্তী স্তরের প্রতিনিধি ঃ প্রতিটি প্রদেশেই স্থানীয় সরকারের মধ্যবর্তী স্তর অর্থাৎ পঞ্চায়েতী সমিতির চেয়ারম্যানগণ জেলা পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করেন। এটা বলা যায় যে, প্রতিটি পঞ্চায়েতী সমিতির চেয়ারম্যানরাই তাদের এক্স অফিসিও সমর্থন দ্বারা জেলা পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই এক্স অফিসিও সদস্যদের ভোটদানের ক্ষমতা থাকে। যে সব প্রদেশের জেলা পরিষদে শুধু এক্স অফিসিও সদস্য থাকেন সে প্রদেশগুলি হলো-অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, তামিলনাড়ু এবং উত্তর প্রদেশ।

২। সরাসরি নির্বাচিত সদস্য ঃ শুধু মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট প্রদেশেই পঞ্চায়েতী সমিতির এজেন্ট হিসেবে তাঁরা জেলা পরিষদের সম্পূর্ণভাবে নির্বাহী কর্তৃত্ব নিয়ে কাজ করেন। এই প্রদেশ দু'টিতে জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা কাজ করেন। মহারাষ্ট্রে সরাসরিভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জেলা পরিষদে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকেন। এখানে ৪০ থেকে ৬০ জন কাউন্সিলারকে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে বাছাই করা হয়। সাধরণত একজন কাউন্সিলার প্রায় ৩৫,০০০ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন।

কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ এবং মধ্য প্রদেশে জেলা পরিষদের কতিপয় সদস্যকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়। তবে অন্যান্য সদস্যরা এক্স অফিসিও সদস্যও হতে পারেন। বিহার এবং পাঞ্জাবে কয়েকজন সদস্য এক্স অফিসিও। আর বাকিরা সংশ্লিষ্ট জেলার পঞ্চায়েতী সমিতির চেয়ারম্যানদের দ্বারা গঠিত নির্বাচক মন্ডলীর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

৩। কো-অপ্ট করা সদস্যবৃন্দ ঃ অন্যান্য স্তরের পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের মতো জেলা পরিষদের গঠন প্রক্রিয়ায় সদস্য কো-অপ্ট করার নীতি ভারতের প্রায় সবক'টি প্রদেশে মেনে চলা হয়। তামিলনাড়ু বাদে ভারতের সবক'টি প্রদেশে মহিলা, তপসীলি সম্প্রদায় এবং তপসীলি উপজাতিদের প্রতিনিধি জেলা পরিষদের কো-অপ্ট করা সদস্য হিসেবে মনোনীত হন স্বয়ংক্রিয়ভাবে। রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশে প্রশাসন, পল্লী উন্নয়ন এবং সামাজিক জীবনযাত্রার বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের কো-অপ্ট করার রীতি প্রচলিত আছে। সকল কো-অপ্ট করা সদস্যেরই ভোটদানের অধিকার আছে।

৪। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য ঃ মিউনিসিপ্যাল কমিটি, স্কুল বোর্ড, কো-অপারেটিভ সোসাইটিসমূহ, মার্কেটিং বোর্ড প্রভৃতি সংবিধিবদ্ধ সংস্থার প্রতিনিধিগণ পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সহযোগী সদস্য হিসেবে পদাধিকার বলে কাজ করেন। তবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা থাকে না।

৬। দাপ্তরিক সদস্য ঃ মহারাষ্ট্র, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের জেলা পরিষদসমূহে দাপ্তরিক সদস্য মনোনয়নের কোন বিধান রাখা হয়নি। অপরদিকে কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ু প্রদেশের জেলা পরিষদে দাপ্তরিক সদস্যদের জেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকতে দেয়া হয়। আর এসব সদস্যরা হলেন জেলা পর্যায়ের পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের জন্য ক্রিয়াশীল বিভাগসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ। আসাম, উড়িষ্যা, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ

এবং পাঞ্জাব এর জেলা পরিষদসমূহে জেলা শাসক অথবা কালেক্টর এবং জেলা উন্নয়ন কমিশনার প্রমুখ কর্মকর্তাদের শুধু জেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেয়। তবে এভাবে মনোনীত অফিসিয়াল সদস্যরা মূলত উপদেশমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। অফিসিয়াল সদস্যরা ভোটধিকার প্রয়োগ করার অথবা কোন অফিস ব্যবহারের সুযোগ পান না।

৭। চেয়ারম্যান ঃ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অনেক ক্ষমতার অধিকারী। যে সব প্রদেশে জেলা পরিষদ প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অধিকারী, সে সব প্রদেশে এই ক্ষমতা বা কর্মপরিধির ব্যাপ্তি অনেক বিস্তৃত। এভাবে জেলা পরিষদসমূহ একটি জেলায় ব্যাপক ক্ষমতা ভোগের মাধ্যমে শক্তিধর অবস্থানের অধিকারী। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সরাসরিভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। অরুণাচল এবং তামিলনাড়ুতে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণ মনোনয়নের মাধ্যমে আসেন। বাকী প্রদেশগুলিতে তাঁরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বোচ্চ স্তরে আসীন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তথা নির্বাহী প্রধান হিসেবে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বিস্তর প্রশাসনিক ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ এবং প্রয়োগ করে থাকেন। তিনি জেলা পরিষদের সভার সভাপতিত্ব করেন এবং এই সভার কার্য বিবরণী লিপিবদ্ধ ও বাস্তবায়ন করেন। তিনি সভা আহবান করেন এবং সভার আলোচ্যসূচিসমূহ নির্ধারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকেন। তিনি জেলা পর্যায়ের পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির সিলেকশন কমিটির সভাপতি হিসেবে কাজ করেন। আর এই কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি জেলার অন্তর্গত সমস্ত গ্রামীণ পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্য মনোনয়ন দান করেন। জেলা পর্যায়ে গৃহীত স্কীমসমূহ এবং সমুদয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের তিনিই নিয়মিতভাবে তদারকী ও পরিদর্শন করেন। বিধিগতভাবে নির্ধারিত তার ক্ষমতার বাইরেও তিনি জেলায় অনানুষ্ঠানিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিদ্যমান থাকেন। তিনি সংগত কারণেই রাজনৈতিক দলগুলিতেও মর্যাদাশীল আসন এবং পদমর্যাদা পেয়ে থাকেন। তিনি পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ রাজ্য সভা এমনকি লোক সভায় সদস্য অর্থাৎ MLA অথবা MNA হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য যোগ্য প্রার্থী হিসেবেও সমাজের কাছে সমাদৃত হয়ে থাকেন। প্রকৃত অর্থে সমুদয় কর্তৃত্ব এবং সামগ্রিক কর্মকান্ডের প্রতিভূ অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সমুদয় কর্মকান্ড সম্পন্ন করে থাকেন। জেলা পরিষদের সকল সদস্য একত্রিভাবে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করলেই জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করা যায়। বেশীর ভাগ প্রদেশেই এভাবে কঠোর প্রক্রিয়ায় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যায়। পাঞ্জাবে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্বাচনের দিন থেকে এক বছরের মধ্যে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আর অনাস্থা আনা যাবেনা মর্মে আইন পাশ করা হয়েছে। আর অনাস্থা প্রস্তাব

যখন আনা হবে তখন সেই প্রস্তাবটি আবশ্যিকভাবে দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত/কো-অপ্ট করা সদস্যের ভোটে পাশ হতে হবে।

পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের কমিটি ব্যবস্থা

ভারতের পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এগুলির কমিটি ব্যবস্থাপনা। পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্রকারী আইনগুলিতে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সর্বস্তরে কমিটি গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানসমূহ আকৃতিতে ছোট হওয়ার ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে বিস্তারিতভাবে আলাপ আলোচনা করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় এবং প্রতিটি সদস্য বা কাউন্সিলারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন। ভারতের সবক'টি প্রদেশেই কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। তবে সংখ্যা, আকৃতি এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে ঐক্যের অভাব আছে। কয়েকটি প্রদেশে এরূপ কমিটির সংখ্যা এক থেকে আটটি পর্যন্ত হয়। অন্যান্য প্রদেশগুলিতে সুনির্দিষ্টভাবে কমিটি ব্যবস্থার কোন সংস্থান রাখা হয়নি, তবে পঞ্চায়েতসমূহ তাদের প্রয়োজন মতো কমিটি গঠন করতে পারে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো পঞ্চায়েত সমিতিগুলিও সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে ষ্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। মধ্যবর্তী পর্যায়ে সার্বিক কর্মকান্ড সম্পাদনের লক্ষ্যে তিন থেকে আটটা পর্যন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রদেশগুলির পঞ্চায়েত সমিতি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। আসাম, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং কর্ণাটক প্রদেশে শুধু তিনটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে কাজ সম্পাদিত হয়। অথচ বিহারে আটটি কমিটি গঠনা করা হয়। গুজরাটে মাত্র দু'টি কমিটি (উৎপাদন কমিটি এবং নির্বাহী কমিটি) গঠন করা হয়। তবে এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী অনধিক পাঁচটি পর্যন্ত কমিটি গঠন করা যায়। ভারতে সবক'টি প্রদেশেই জেলা পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিটি গঠনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এসব কমিটির অফিসের কার্যক্রমের মেয়াদ এবং চেয়ারম্যানদের নিয়োগদানের প্রক্রিয়ায় এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যথেষ্ট ভিন্নতা থাকে।

এটা সত্য যে, পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের কমিটি ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এসব কমিটির পারফরমেন্স সম্বন্ধে বিভিন্নজন বিভিন্ন মত পোষণ করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কমিটি ব্যবস্থায় কয়েকজন ব্যক্তির শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একচেটিয়াত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, কমিটির সিদ্ধান্ত প্রায়শঃই রাজনৈতিক প্রভাব এবং স্বার্থান্ধতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আবার কমিটির সদস্যবৃন্দ তাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে বাধাগ্রস্ত হন এবং স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটাতে পারেন না ভারতের স্থানীয় সরকারসমূহে মূলত কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করার ঐতিহ্য না থাকার কারণে।

শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ

ভারতে মোট ৫ ধরনের শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ক্রিয়াশীল।

নিম্নে এসব শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো ঃ

(ক) মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ঃ

ভারতের বৃহদাকার শহরগুলির বড় ধরনের সমস্যা সমাধান ও সেবা প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠিত হয়। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলগুলি থেকে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনসমূহ অনেক বেশী ক্ষমতা ও স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করে থাকে। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরশনসমূহ মূলত দু'ধরনের কাজ করে।

(১) বাধ্যকরী কার্যক্রমসমূহ

(২) ঐচ্ছিক কার্যক্রমসমূহ

ভারতে বিদ্যমান মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনসমূহের আকৃতি, জনসংখ্যা, খাজনা আদায় প্রভৃতি দিক দিয়ে একটির সাথে অন্যটির পার্থক্য থাকলেও এগুলোর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য সমূহ পরিলক্ষিত হয় ঃ

(১) প্রাদেশিক আইন সভা কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীনে একটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের গঠন মূলত নির্বাহী কর্তৃত্ব থেকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে বিকশিত হয়।

(৩) কর্পোরেশনের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান হিসেবে একজন মেয়র সর্বদা কাজ করেন। নবায়নযোগ্য এক বছর মেয়াদকালের জন্য তিনি ক্ষমতাসীন থাকেন।

(৪) প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্পোরেশনের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকী করে। এই প্রতিষ্ঠানের অবসান ঘটিয়ে তার প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হাতে নেয়ার ক্ষমতাও প্রাদেশিক সরকার সংরক্ষণ করে।

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে মেয়র হলেন মধ্যমনি। তাকে সহযোগিতা করার জন্য কমিশনারবৃন্দ কাজ করেন। তাছাড়া কাউন্সিল ও কাউন্সিল কমিটি গঠিত হয় প্রতিটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এর কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালিতকরণের লক্ষ্যে। এই কাউন্সিলের সদস্যগণ সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে ৩ থেকে ৫ বছরের (প্রদেশে প্রদেশে সময়ের বা মেয়াদের ভিন্নতা থাকে) জন্য নির্বাচিত হয়। এই কাউন্সিল মূলত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আইন সভা হিসেবে কাজ করে। এই কাউন্সিল গুলির আকৃতিগত ভিন্নতা রয়েছে প্রদেশ থেকে প্রদেশে। কোন কোন প্রদেশে এই সদস্য সংখ্যা ২২ জন। যেমন পশ্চিম বঙ্গের চন্দননগর কর্পোরেশন। আবার মুম্বাই কর্পোরেশনের মত বৃহৎ কর্পোরেশনের কাউন্সিল ১৩১ সদস্য বিশিষ্ট হয়।

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাউন্সিল সদস্যরা কাউন্সিলার হিসেবে পরিচিত। কোন কোন প্রদেশে এই কাউন্সিলারদের দ্বারা অল্ডারম্যানগণ নির্বাচিত হন। এই অল্ডারম্যানগণ নির্বাচিত কাউন্সিলারদের মত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

কর্পোরেশনের মেয়রগণ এই কাউন্সিলের আইনগতভাবে প্রধান ব্যক্তি, অল্ডারম্যান এবং কাউন্সিলারদের মধ্য থেকে তাদের দ্বারাই এক বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। এই মেয়রগণের কোন প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকেনা। প্রশাসনিক কর্তৃত্ব মূলত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার (যারা সরকারী কর্মচারী) দের হাতে থাকে। মুখ্য প্রশাসক হিসেবে কমিশনার সমগ্র কর্পোরেশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার তদারক করেন এবং কাউন্সিলের সচিবালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্তা হিসেবে কাজ করেন। তবে কোন কোন কর্পোরেশনের মেয়র কর্পোরেশনের সমস্ত ধরনের রেকর্ড পত্র দেখতে পারেন এবং কর্পোরেশনের যে কোন ধরনের তথ্য প্রদানের জন্য বলতে পারেন। নির্দিষ্টকৃত সংখ্যক কাউন্সিলাররা সভা আহবানের জন্য রিকুইজিশন প্রদান করলে মেয়র বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারেন।

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম দেখাশুনার জন্য বিভিন্ন রকমের কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিগুলি বিধিবদ্ধ অথবা অবিধিবদ্ধ হতে পারে। এই কমিটি গুলির মধ্যে ষ্ট্যান্ডিং কমিটি হলো সব থেকে শক্তিশালী কমিটি। ষ্ট্যান্ডিং কমিটি মূলত ষ্টিয়ারিং কমিটি হিসেবে কাজ করে। এই কমিটি পারসোনেল ব্যবস্থাপনা, সামগ্রিক প্রশাসন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার তদারক করে। অল্ডারম্যান এবং কাউন্সিলরগণের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অনুযায়ী তাদের মধ্য থেকে ষ্টান্ডিং কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ষ্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানও এই কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এদিক থেকে বিবেচনা করে এই ষ্ট্যান্ডিং কমিটিকে কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কমিটি বলা যায়। বিধিগতভাবে প্রাপ্ত ক্ষমতানুযায়ী এই কমিটি কাজ করে থাকে। এই কমিটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার এবং মিউনিসিপ্যাল প্রশাসনের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার তার কার্যক্রমের জন্য এই ষ্ট্যান্ডিং কমিটির নিকট দায় বদ্ধ থাকেন। প্রাদেশিক সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট মেয়াদের (৩ বছর থেকে ৫ বছর) জন্য নিয়োজিত হয়ে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। সাধারণত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয়ে তিনি কর্পোরেশনের বাজেট প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। আর জরুরী অবস্থার সময় তিনি যে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। তবে নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যকরণের দর্শনের উপর ভিত্তি করে কশিনারের নিয়োগ প্রদান করা হয়।

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনারের কাজকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ (১) বিধিবদ্ধ কার্যাবলী (২) ষ্ট্যান্ডিং কমিটি ও কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাবলী।

কর্পোরেশনের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি কাউন্সিলের এবং কমিটির সভায় জোরালোভাবে মত ব্যক্ত করতে পারেন। কিন্তু তার কোন ভোটদানের ক্ষমতা নেই। তিনি কর্পোরেশনের সকল কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মচারীদের নিয়োগ, পদন্নোতি এবং শৃঙ্খলামূলক বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণ করেন এবং এতদ্বিষয়ে ষ্ট্যান্ডিং কমিটিও কাউন্সিল কমিটির সাথে ক্ষমতার শরীক হিসেবে কাজ করেন। আর কর্পোরেশনের বাজেট তৈরী করার দায়িত্ব কমিশনারের উপরে ন্যস্ত থাকে। তবে বাজেট পাশ করার ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এক খাত থেকে অন্য খাতে অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কাউন্সিল কমিটি এবং ষ্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে মতামত নিতে হয়। এই কাউন্সিল কমিশনারের একচ্ছত্র ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ অথবা পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

(খ) মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ঃ

ভারতের প্রায় এক হাজার আটশত মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল আছে। প্রদেশগুলির প্রণীত আইন অনুযায়ী এই কাউন্সিলসমূহ পরিচালিত হয়। ভারতের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠনের ও বিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন সমূহ মূলত এই শতকের ২০ এবং ৩০ এর দশকে প্রণীত হয়েছিল। তবে ৫০ এর দশকে এসে ভারতের বেশীর ভাগ প্রদেশেই যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং প্রদেশসমূহের সীমানা চিহ্নিতকরণের সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়ন করেছে।

মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল মূলত মাঝারী ধরনের শহরগুলিতে (যেখানে শহুরে উপাদান সমূহের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুভূত হয় অথচ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা নাই) গঠিত হয়। কোন শহরের লোকসংখ্যার ভিত্তিতে যদিও মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠিত হয়, তবুও এই সংখ্যার কোন নির্দিষ্ট মাত্রা নাই। উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি প্রদেশের মাত্র ৫,০০০ লোক বসতি সম্পন্ন শহরেও মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠিত হয়। আবার গুজরাটের মতো প্রদেশে ত্রিশ হাজার লোক বসতি সম্পন্ন শহরের জন্য মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠিত হয়। লোক সংখ্যার অনুপাত ছাড়াও কোন কোন প্রদেশে আয়ের বিষয়টিও মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠনের ক্ষেত্রে শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে মিউনিসিপ্যাল আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে। এসব আইন 'বাই ল' হিসেবে বিবেচিত হয়। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের কাউন্সিলরগণ ৩ থেকে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। আর মিউনিসিপ্যাল আইন দ্বারা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। এখানে তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে রাখা হয়।

কাউন্সিলরগণ তাদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। এই প্রেসিডেন্টই মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সভা আহ্বান করেন। আড়ম্বরপূর্ণ মেয়রের অফিস থাকা সত্ত্বেও মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের হাতেই নির্বাহী

ক্ষমতা প্রদান করা হয়ে থাকে। তিনি মিউনিসিপ্যালটির সাধারণ প্রশাসন এবং আর্থ-বিষয়ক ব্যবস্থাপনা তদারক করেন। কোন কোন প্রদেশে তিনি নির্বাহী অফিসারের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আপীল শ্রবণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করেন এবং তার হাতে থাকা জরুরী ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করেন। তিনি সমুদয় রেকর্ড পত্র দেখার ক্ষমতা রাখেন এবং মিউনিসিপ্যাল প্রশাসনে যে কোন তথ্য প্রদানের জন্য যে কোন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলতে পারেন।

বেশিরভাগ প্রদেশের কাউন্সিলই নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিয়োগদান করে থাকেন। উড়িষ্যা, তামিলনাডু এবং কর্ণাটক প্রদেশে তিনি প্রাদেশিক সরকার দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার মাধ্যমে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশন দ্বারা তিনি অপসারিত হতে পারেন। তিনি বাস্তবিক অর্থে সব দিক থেকে চেয়ারম্যানের অধীন থেকে কাজ করেন। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের মধ্যে পুরোপুরিভাবে কমিটি ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল থাকে। তাছাড়াও আইন যে কোন প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে এই সব কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিধান রেখেছে।

(গ) নোটিফাইড এরিয়া কমিটি ঃ

যে সব এলকায় মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠন করার মত প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরনের অবস্থা বিদ্যমান নাই, অথচ এলাকাটি গুরুত্বপূর্ণ সেসব এলাকায় নোটিফাইড এরিয়া কমিটি নামে বিশেষ ধরনের কমিটি গঠন করা হয়। নোটিফাইড এরিয়া কমিটি সাধারণত একটি উন্নয়নমুখী শহরের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে গঠিত হয়। প্রাদেশিক সরকার সাধারণত সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই কমিটি গঠনের বিষয়টি ঘোষণা করেন। মিউনিসিপ্যাল আইনের কাঠামোর মধ্যেই এই কমিটির কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। এই কমিটির হাতে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সমুদয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই কমিটি সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি সংস্থা। এখানে নির্বাচিত সদস্যের কোন বিধান রাখা হয়নি। এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক সরাসরিভাবে মনোনীত হয়ে থাকেন।

(ঘ) টাউন এরিয়া কমিটি ঃ

প্রায় চারশ'টি টাউন এরিয়া কমিটি সমগ্র ভারতে ক্রিয়াশীল। প্রাদেশিক সরকার দ্বারা পাশকৃত পৃথক আইন বলে টাউন এরিয়া কমিটিসমূহ পরিচালিত হয়ে থাকে। তবে জেলা কালেক্টরের হাতে এই কমিটিসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এই কমিটির সদস্যবৃন্দ আংশিকভাবে নির্বাচিত হন এবং আংশিক সদস্যরা সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। এই কমিটি কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজ করে থাকে। টাউন এরিয়া কমিটির পরিবর্তে নগর বা শহর পঞ্চায়েত গঠন করার জন্য কয়েকটি প্রদেশে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

(ঙ) ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ঃ

১৯৯১-সালের আদমশুমারীর তথ্যানুযায়ী ভারতে মোট ৬৩টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ক্রিয়াশীল ছিল। এ প্রতিষ্ঠান মূলত ক্যান্টনমেন্ট এলাকার কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকে।

ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের গঠন এবং কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত কিছু সমস্যা ঃ

ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সামগ্রিক কর্মকান্ড ও প্রভাবের উপরে বিশেষত এর আর্থ-সামাজিক প্রভাবের উপরে ব্যাপকভাবে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এসব গবেষণার ভিত্তিতে দেখা গেছে ঃ

(১) ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে যারা নির্বাচিত হয়ে আসেন তাদের মধ্যে খুব কমই দরিদ্রতম শ্রেণী থেকে আসেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বেশীর ভাগই আসেন সমাজের মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে।

(২) আইন প্রণয়ন বা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য যতো প্রচারণা চালানোই হোক না কেন, ভারতের স্থানীয় সরকারসমূহের ক্ষমতা কাঠামোতে খুব কম সংখ্যক মহিলারই প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

(৩) অনুরূপভাবে ভারতের তফসীলী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় সরকারসমূহে প্রতিফলিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হলেও খুব কম ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘু এবং তফসীলি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনের প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছে।

(৪) বেশীর ভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর মাধ্যমিক পর্যায়ের ঊর্ধ্বে যায় না। বরং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিনিধি মাধ্যমিক এবং নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে এমন কি শুধু ন্যূনতম অক্ষরজ্ঞান নিয়ে নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

(৫) এই ধরনের প্রতিকুল পরিস্থিতির কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদের সমাবেশ করণের ক্ষেত্রেই শুধু সমস্যার সৃষ্টি হয় না এবং যে সব কর্মসূচী এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান করে তার গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পগুলি যথার্থভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

(৬) ভারতের শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৃটিশদের অনুকরণে আজও নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিয়োগদানের যে ব্যবস্থা চালু আছে তার ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে সরকারী কর্মচারীদের প্রতিপত্তি বেশীমাত্রায় ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। যেমন মুম্বাইয়ের মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের এবং রাজনৈতিক নির্বাহী হিসেবে কাউন্সিলের মেয়রের মনোনয়ন প্রদান করা হয়। বর্তমানে এই সমস্যাটির প্রকটতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এজন্যই যে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের নিয়োগদানের ফলে তাদের

সাথে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রায়ই মতদ্বৈধতা দেখা দেয় এবং এই মতদ্বৈধতার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই শুধু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না বরং তা স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

ভারত ও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তুলনা

যদিও ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যান্য উন্নত গণতান্ত্রিক দেশের মতো অতটা সুবিকশিত নয়, তবুও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে তুলনামূলক আলোচনায় বলা যায় যে, ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তুলনায় অনেকটা উন্নত সুসংহত এবং ধারাবাহিকতার সোপান বেয়ে অনেক বেশী অগ্রগামী। নিচে সংক্ষেপে ভারত এবং বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হলো।

(ক) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল। প্রায় প্রতিটি দশকেই এখানে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে উন্নয়নের নামে সংস্কারের নামে, অথচ ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ঐতিহ্যকে লালন করে বিকশিত হয়েছে। ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন যে হয়নি তা নয়। তবে ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামোতে যে সব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা স্থানীয় সরকার কাঠামোকে লালন করে তার উত্তরোত্তর বিকাশমানতার মাধ্যমে সাধিত হয়েছে।

(খ) ভারত আজকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে নিজেকে বিকশিত করার সাথে সাথে গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ গঠনের বা লালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও জোরালো ভূমিকা রেখেছে। অথচ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ যেখানে প্রায়শঃই হুমকীর সম্মুখীন থেকেছে সেখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় হতে না পারাটাই স্বাভাবিক।

(গ) বাংলাদেশ যে ভূখন্ড নিয়ে গঠিত তা বার বার সামরিক শাসনের অধীন থেকেছে। ফলে বিশ্বের আরও যে সব দেশ সামরিক শাসনের অধীনে ছিল, সে সব দেশের মতো বাংলাদেশেও নতুন নতুন ধরনের স্থানীয় সরকার কাঠামো গঠনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি যেন পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ একটা সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা নিয়ে বিকশিত হয়েছে।

উভয় দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সাদৃশ্য

উপরের পার্থক্যগুলি থাকা সত্ত্বেও ভারত ও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বেশ কিছু কিছু মিল বা সাদৃশ্য বিদ্যমান;

ক) ভারত এবং বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলির মতো স্বয়ং সম্পূর্ণ সাবলীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হতে পারেনি বা হয়নি।

(খ) এ দু'টি দেশের স্থানীয় সরকারসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(গ) এ দু'টি দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সব প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তারা দলনিরপেক্ষ প্রার্থী হয়ে থাকেন। অর্থাৎ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিতে যারা জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন তারা দল-নিরপেক্ষ ব্যক্তি হয়ে থাকেন।

(ঘ) এ দু'টি দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ মূলত সমাজের উচ্চতর শ্রেণী থেকে আসেন।

(ঙ) ভারত ও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা কাঠামোতে খুব কম সংখ্যক মহিলার প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

(চ) উভয় দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর মাধ্যমিক পর্যায়ের উর্ধ্বে উঠে খুব কম ক্ষেত্রেই।

(ছ) উভয় দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আজও জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

(জ) ভারত এবং বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয়ভাবে সম্পদ সমাবেশকরণের ক্ষেত্রে তেমন কোন ভূমিকা পালন করতে পারছেনা।

(ঝ) এ দু'টি দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি স্বশাসিত ও স্বয়ংক্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হতে পারেনি কাঙিক্ষত মাত্রায়।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ খুব একটা শক্তিশালী অবস্থানে যেতে পারেনি। যদিও বলা হয় যে, শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের বিকাশ এবং স্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের অন্যতম অপরিহার্য শর্ত, তবুও ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে অব্যাহতভাবে গণতন্ত্রের চর্চা চলে এসেছে সেখানে শক্তিশালীভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বিকাশ না ঘটা সত্যিই দুঃখজনক। বৃটিশ আমলে ভারতে যে ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেছিল, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মোটামুটিভাবে সেভাবেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেছে। স্বাধীন ভারত ভূমির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং অন্যতম দার্শনিক মহাত্মা-গান্ধীর দর্শনের অনুসরণে গ্রামীণ স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানাদির বিকাশের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। এজন্য প্রয়োজনীয় কমিশনও গঠিত হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ভারতে স্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকশিত হয়নি সেরূপভাবে। ভারতের সংবিধানে স্থানীয় সরকারের যথাযথভাবে বা স্বশাসিতভাবে বিকাশের জন্য তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। আশ্চর্জনক হলেও সত্য যে, ভারতে কেন্দ্রীয়ভাবে স্থানীয় সরকার বিকাশের জন্য

সংবিধানের তেমন কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত না হওয়ায় বিশালকায় ভারতের এক প্রদেশে যেভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেছে, অন্য প্রদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ ঘটেছে ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। সর্বভারতীয়ভাবে বিবেচনায় দেখা যায় যে, ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ সনাতনী পদ্ধতির আদলেই সম্পন্ন হয়েছে। দু'একটি প্রদেশে যদিও আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্থাৎ স্বশাসিত ও আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, তবুও ভারতের সবক'টি প্রদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ঘটেনি। তবে আশা করা যায় যে, 'গ্লোবালাইজেশন' এর পরিপ্রেক্ষিত চিন্তা করে ভারতেও বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের অনুকরণে শক্তিশালী, স্বশাসিত এবং আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিকশিত হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Majumdar, R. C. (1960). *The History & Culture of Indian People*, Vol. 11, Bombay.
2. Bhatnagar, S. (1978). *Rural Local Government in India*. Light & Life Publishers, New Delhi.
3. Jain, S. C. (1967). *Community Development and Panchayeti Raj in India*, Bombay.
4. Khanna, R. L. (1977). *Panchayeti Raj in India*, English Book Depot, Ambala.
5. Maheshwar, S, R. (1987). *Local Government in India*. Lakshmi Narain Agarwal, Agra.
6. Siddiqui, Kamal (1992). *Local Government In South Asia*. UPL, Dhaka.
7. Malviya, H. D. (1956). *Village Panchayet in India*, All India Congress Committee, New Delhi.
8. Narain, J. P. (1970). *Communitarian Society and Panchayeti Raj*, Navachetana, Varanase.
9. Nahru, J. L. (1945). *Glimpses of World History*. Lindsay Drummond Ltd. London.
10. Ahmed A, U. (1989). *Revitalizing Panchayeti Raj in India*. Journal of Local Government, NILG, Voll 18, No. 1, Jan-June.

11. Bhattacharya, M. (1970). *Essays in Urban Government*. Calcutta, The World Press Private Ltd..
12. Chaturvedi, T. N. and R. B Jain (eds.) (1981). *Panchayeti Raj*. IIPA, New Delhi.
13. Chaturavedi, T. N. and Datta, Abbifit (1984). *Local Government. IIPA*. New Delhi.
14. Jangain, R. T. and Sharman, BAV. (1972). *Leadership in Urban Government*. Sterling Publisher, New Delhi.
15. Kopardekar, HD and Sastry SMY. (1990). *The Role of Local Government Development in India*. Quarterly Journal Vol LXI, No.2, A IILSG, Bombay.
16. Maheshwari, S. R. (1987). *Local Government in India*. Laxmi Narayan Agarwal, Agra (Fourth edition).
17. Sachdeve, L. And Dua, N. (1986). *Local self-Government in India*. Ajanta Publishers, New Delhi.